■ **ধারণা** : মানব সমাজের উদ্ভব একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়নি। মানুষের সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগেরই ফলশ্রুতি হল মানব সমাজ। মানুষের প্রয়োজন পূরণের তাগিদে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই মানব সমাজ গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক গিডিংস (F. H. Giddings)-এর মতানুসারে, 'নিজেদের ঐক্য সম্পর্কে সচেতন সমমনোভাবাপন্ন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে একযোগে চেষ্টা করলে সমাজের সৃষ্টি হয়।'

তবে এই মানব সমাজের উৎপত্তি হয়েছে ক্রমবিবর্তনধারায়। বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করে মানব সমাজ আধুনিককালের এই জটিলরূপ ধারণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানী কোঁৎ (Comte) এর অভিমত অনুসারে 'মানব সমাজের উদ্ভব হয়েছে মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে। তারপর এই সমাজের ক্রমবিকাশ বা প্রগতি ঘটেছে।

সমাজবদ্ধ জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষ সংস্কৃতিকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের পরিবর্তন এনেছেন। বিবর্তনের ইতিহাসে এই সংস্কৃই মানুষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছে। সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের সংস্কৃতির কার্যকলাপের নিদর্শন চোখে পড়ার মত। মানুষের সাংস্কৃতিক জগতের অন্যদিকে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তনে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের কারণে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিন্তাভাবনা ও জীবনজীবিকার পার্থক্য ঘটেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বিভিন্নতার মধ্যেও সংস্কৃতির কারণে মানুষ সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং অভিযোজিত হয়েছে তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

■ **খাদ্যদ্রব্য নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব (Influence of Environment on Selection of Foods)** : যে কোন অঞ্চলের খাদ্যদ্রব্য নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা যে খাদ্যদ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে, তখন ঐ খাদ্যদ্রব্যই তাদের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ইদানীং চীন, ভারত ও জাপানে গম উৎপাদন বেড়েছে। এ সব দেশের অধিবাসীরা গমজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করছে। উত্তর কানাডা, গ্রীনল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য জন্মায় না, কিন্তু মাছ ও মাংসের প্রাচুর্য। তাই এখানকার লোকেদের প্রধান খাদ্য মাছ ও মাংস। পরিবেশগত কারণেই বাঙালিরা মাছ এবং পাঞ্জাবীরা মাংস বেশি পছন্দ করে।

■ **পোশাক-পরিচ্ছন নির্বাচনে পরিবেশের প্রভাব (Influence of Environment or Selecting Cloths)** : কোন অঞ্চলের মানুষ কি পোশাক পরিধান করবে তা প্রধানত নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের জলবায়ুর ওপর। সুতরাং অঞ্চলভেদে, পরিবেশগত বৈচিত্র্যের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদে পার্থক্য ঘটে। ক্রান্তীয় ওউপক্রান্তীয় অঞ্চলের যেখানে আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু বিরাজ করে, সেখানে নারী ও পুরুষ সকলেই কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করে। আবার শীতপ্রধান অঞ্চল, যেমন—কানাডা, আমেরিক্ত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা পশমের পোশাক পরিধান করে।

■ **বাসগৃহের উপর পরিবেশের প্রভাব (Influence of Environment on House) :** স্থানীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের কারণে ঘরবাড়ি নির্মাণে নানারূপ পার্থক্য দেখা যায়। কোনো স্থানে ঘরবাড়ি নির্মাণের মালপত্রের সহজলভ্যতা ও অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা, জলবায়ুগত অবস্থা উপর ঘরবাড়ি নির্মাণে বৈচিত্র্যতা আনে। যেমন—বেশি বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত অঞ্চলের ঘরের ছাদ বা ছাউনিকে ঢালু করা হয়। যাতে জল দাঁড়াতে পারে না এবং সহজে গড়িয়ে পড়ে যায়। বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে বাড়ির ছাদ সমতল করা হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে বাসগৃহে উঁচু উঁচু দরজা ও বেশি সংখ্যায় জানালা থাকে।

■ **জীবিকা নির্বাহের উপর পরিবেশের প্রভাব (Influence of Environment on Livelihood) :** মানুষের বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা অর্জন করে। আর এই জীবিকা নির্ভর করে স্থানীয় পরিবেশের উপর। যেমন—কানাডার উত্তরাঞ্চল কৃষির অনুপেযোগী, কিন্তু ওখানে বনভূমির প্রাচুর্য আছে। তাই এ অঞ্চলের অধিবাসীরা কাঠ সংগ্রহ, কাঠ চেরাই ও কাঠের বিপণন প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

আবার মেরু অঞ্চলে কৃষি, পশুপালন বা অন্যান্য শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয় বলে এখানকার অধিবাসী এস্কিমোরা সীল ও তিমি মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

নদী উপত্যকার সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর, জলসেচের সুবিধা ও কৃষি উপযোগী জলবায়ু জন্য বিভিন্ন প্রকার কৃষিফসল উৎপাদনের সহায়ক। যেমন—সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি, ইয়াংসি উপত্যকা, মারে-ডার্লিং অববাহিকা প্রভৃতি কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই সব স্থানের অধিবাসীরা কৃষিকাজকে তাদের প্রধান উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

অন্যদিকে জলবায়ুগত কারণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কৃষিজ শস্য উৎপাদনের উপেযাগী হয়ে ওঠে। তাই ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলে ধান চাষ ভাল হয়। মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় গম চাষ ভাল হয়। ক্রান্তীয় আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলে পাট চাষ ভাল হয়। তুলা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তরীয় জলবায়ুর ফসল। কৃষ্ণ মৃত্তিকায় কফি চাষের উপযুক্ত বলে, সেখানে প্রচুর কফি বাগিচা গড়ে উঠেছে। এইভাবে কৃষিকাজের বিভিন্ন স্তরে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের অভিযোজন সম্পর্কটি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং বিভিন্ন কারণে মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আবার প্রয়োজনে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে পরিবেশে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলে। সুতরাং মানব সমাজ ও তার ক্রমবিবর্তন পর্যালোচনা করলে সহজে অনুভব করা যায় যে মানুষ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে তার সমস্ত কার্যসাধন করে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে কিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, নিম্নে তার আলোচনা করা হল:—

■ **আদিম সংগ্রহকারী অর্থনীতি (Primitive collector Economy) :** মানুষের অর্থনৈতিক জীবন শুরু হয়েছে কয়েক হাজার বছর পূর্বে। তখন মানুষ কেবল ফল সংগ্রহ ও পশু শিকার করেই তার আহার এর সংস্থান করত। সময়ের সাথে সাথে এই অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান শিল্প-বাণিজ্য ও পরিষেবামূলক কার্যকলাপে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র এই পরিবর্তন সমানভাবে ঘটেনি। পৃথিবীর কোথাও কোথাও অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে বহির্বিশ্বের এই প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের আলো পৌঁছায়নি। তাই যেখানে মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি, জীবিকা অনেকটাই আদিমযুগের মতই প্রকৃতি নির্ভর। জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি থেকে যা পাওয়া যায় তার ওপরই মানুষ নির্ভরশীল। তাই পৃথিবীর এরূপ এক এক প্রতিকূল পরিবেশে এক এক ধরনের আদিম সংগ্রহভিত্তিক অর্থনীতি দেখা যায়। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

■ **ফলমূল সংগ্রহ (Collection of Fruits and others) :** আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চল, নিউ-গিনি বনভূমি কালাহারি মরুভূমি বা উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আদিম যুগের মতই ফলমূল সংগ্রহ

করে খাবারের ব্যবস্থা করা বা লতাপাতা দিয়ে বস্ত্র বানানো বা গাছের ছাল পাতা দিয়ে বসত নির্মাণের পদ্ধতি আজও দেখা যায়।

কালাহারি মরুভূমি ও উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আকারে কৃষিকাজ করা সম্ভব নয় তাই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য গাছের ফলমূল, পাতা সংগ্রহ করেই জীবনধারণ করে।

■ শিকার পদ্ধতি (Hunting) :

পশুশিকার ও মৎস্যশিকার কৃষিকার্য উদ্ভাবনের পূর্বে ছিল জীবনধারণের একমাত্র মাধ্যম। পশুশিকার করে তাকে কাঁচা বা পুড়িয়ে খাবার রীতিই ছিল আদিম মানুষদের প্রধান অভ্যাস, যা আজও অনেক জনজাতি অনুসরণ করে চলেছে। আবার নদীপ্রধান বা সমুদ্র তীরবর্তী কিছু আদিবাসী মৎস শিকার, শামুক ঝিনুক সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যের যোগান করে। উল্লেখ্য যে বিশ্বে পশুশিকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় 18 হাজার। পৃথিবীর যে সকল স্থানে আদিবাসীরা এখনো পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

(i) কানাডার তুন্দ্রা : এস্কিমো ও লাটিন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান।

(ii) সাইবেরীয় তুন্দ্রা ও তৈগা—স্যামোয়েদ, ওষ্টায়কে (O'stayaks) তুঙ্গস (Tungus), থাকুটাস (Yakuts) যুকাঘিরস্ (Yukaghirs), চুকচিজ (Chockchess)

(ii) দক্ষিণ আর্জেন্টিনা ও চিলি—ইয়াগানস্ কোরয়্যাকস (Koryaks)

(iv) আমাজন অববাহিকা—জিভোরা, ক্যাণ্ডুয়া আমেরিন্দ ইত্যাদি)

(v) কঙ্গো অববাহিকা ও বুশল্যান্ড—পিগমি ও বুশম্যান

(vi) মালয়—সেমাং, সাকাই ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিভিন্ন জনজাতি বা আদিবাসীদের মধ্যে দুপ্রকারের চরম প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকা আদিবাসীদের জীবন ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(i) তুন্দ্রা ও তৈগা অঞ্চলের শিকার (Hunting in Tundra and Taiga)

তুন্দ্রার আর্টিক অঞ্চলে ও উত্তর আমেরিকার ইউরেশিয়ার তৈগা অঞ্চলে বেশ কিছু আদিবাসী থাকে যাদের পশু ও মৎসশিকারই প্রধান জীবিকা। উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত তুন্দ্রা অঞ্চলে শীতে তাপমাত্রা –28°C এর নীচে, থাকে গ্রীষ্মে তাপমাত্রা (3°-4°C) সামান্য বাড়লে বরফ গলতে শুরু করে ও নদীগুলিতে জলপ্রবাহ দেখা দেয়। হ্রদগুলোও নাব্য হয়ে ওঠে। তাই এই সময়টাই জীবিকার অন্যতম সময়। এস্কিমো, চাকচি, তুঙ্গু যুকাঘীরসী সহ বিভিন্ন সাইবেরীয় তুন্দ্রা ও তৈগার অধিবাসীরা পৃথিবীর অন্য দক্ষ শিকারী। যারা কাঠবিড়ালী, নেকড়ে, ভাল্লুক, খরগোস, ক্যারিবু, হরিণ, বনবিড়াল ইত্যাদি প্রাণী এবং হ্রদ, নদী-সমুদ্র থেকে নানাপ্রকার মাছ শিকার করে জীবনধারণ করে। শিকারের অস্ত্র হিসেবে বর্শা, বল্লম ইত্যাদি ব্যবহার করে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই প্রায় শিকারে নিযুক্ত থাকে। যাতায়াতের জন্য এরা স্লেজগাড়ি ও কায়াক নৌকা ব্যবহার করে। এছাড়া বর্তমানে এরা প্রাণীদের লোম সংগ্রহ করে এরা উচ্চমূল্যে বিক্রি করেও অর্থ উপার্জন করেছে।

(ii) ক্রান্তীয় দ্বীপ অঞ্চল, অরণ্য ও সাভানা অঞ্চলের শিকার (Hunting in Tropical Island forest and Savanas) :

ক্রান্তীয় অঞ্চলে কিছু উপজাতি বা আদিবাসী আছে যারা শিকার করে জীবনধারণ করে। কারণ এই অঞ্চলগুলি অতিরিক্ত উষ্ণতা (গড় 35°C তাপমাত্রা সারাবছর), বৃষ্টিপাত (গড় 250 সেমি), সারাবছরই আদ্রর্ততার কারণে আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বস্তিকর। বেশিরভাগ অঞ্চলই ঘন অরণ্যে আবৃত থাকার জন্য বসবাস উপযুক্ত স্থানের অভাব রয়েছে। এখানে এইরকম পরিবেশে তাই কিছু আদিবাসীরাই টিকে রয়েছে যদিও তাদের জীবনযাত্রা একেবারেই আদিম মানুষদের মত। এদের মধ্যে রয়েছে কঙ্গো নদী অববাহিকার পিগমী, মালয়েশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের সাকাই, বোনিওর পুনাম ও সুন্দ দ্বীপের কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায়। এরা তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্রে বিষ মিশিয়ে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী যেমন শুকর, হরিণ, বানর সহ বিভিন্ন ও পাখী নদীর মাছ প্রভৃতি দিয়ে শিকার করে। পরে মাংস লবণে জড়িয়ে রোদে শুকিয়ে ধোঁয়া দিয়ে মাংস সংরক্ষণও করে।

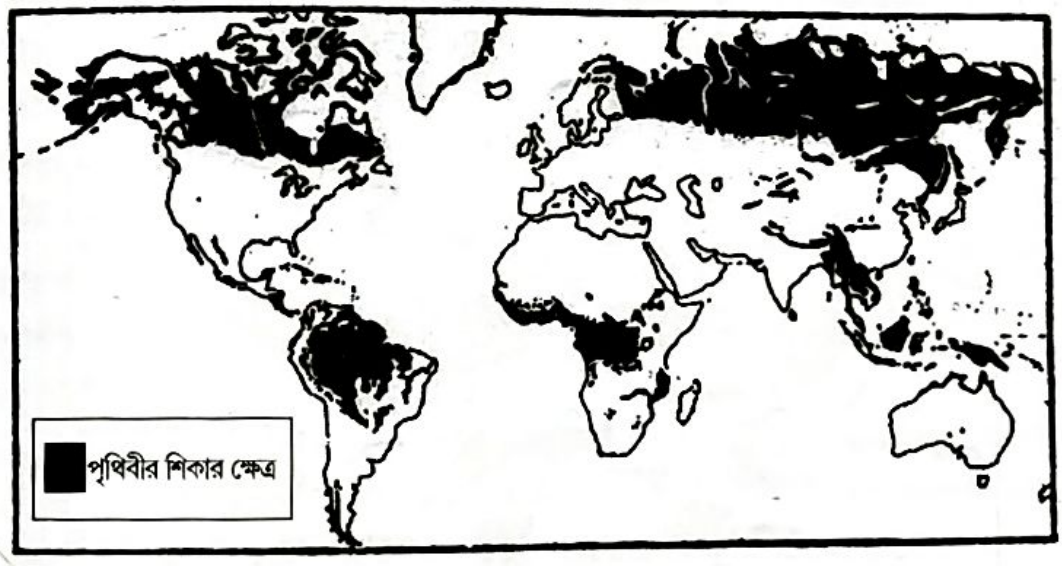

চিত্র ঃ পৃথিবীর শিকার ক্ষেত্র

উক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়াও আরাকান, আর্মেনিয়া আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও ভারতের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কিছু শিকারজীবী জনজাতি রয়েছে। তবে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে তাদেরও জীবনযাত্রা অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। শিকার করার অস্ত্রগুলির পরিবর্তন হয়েছে। অনেকেই আগুনে ঝলসিয়ে খাদ্য আহার করছে। পশুশিকার অনেকের কাছে অপ্রধান পেশায় পরিবর্তিত হয়েছে। কিছু কিছু পশুশিকারীর সভ্য জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে, তারা অনেকে চামড়ার ব্যবসা শুরু করেছে। তাই এই পশু শিকারীদের সংখ্যা অনেক কমছে।

● পশুপালননির্ভর অর্থনৈতিক সমাজ (Pastoral Economy based Society) :

প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুপালন। বিশেষ করে যেসব স্থানে জমি কৃষির অযোগ্য সেখানে জীবিকানির্বাহের অন্যতম মাধ্যম হল পশুপালন। জীবিকাটি অত্যন্ত প্রাচীন হলেও বর্তমানে অনেক আদিবাসী সমাজে এই উপজীবিকার প্রচলন রয়েছে। এমনকি বিশ্বের অনেক দেশে আজও বাণিজ্যিকভাবে পশুপালন করা হয়।

■ পশুপালনের উদ্দেশ্য (Purpose of Pastoral) :

পশুপালনের প্রধান উদ্দেশ্য হল দুগ্ধসহ দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংসের চাহিদা পূরণের জন্যই মূলত পশুপালন করা হয়। খাদ্যসংগ্রহের মাধ্যমে যেখানে খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়, সেখানে তাই পশুপালনই অন্যতম জীবনধারণের উপায়। প্রকৃতপক্ষে আদিম শিকারব্যবস্থার উন্নতিসাধনের পর এই পশুপালন উপজীবিকার উদ্ভব হয়, যা আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ অনেক দেশে। তবে বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে শুধু দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত মাংসের চাহিদাপূরণের উদ্দেশ্যে নয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন পশুজাত দ্রব্য, যেমন চামড়ার জুতো, ব্যাগ, পশম, উল প্রভৃতি বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের জন্যও পশুপালন করা হয়। এছাড়া অনুন্নত দেশে যাত্রী বা মালপরিবহন ও উন্নয়নশীল দেশে কৃষিকাজের সাহায্যের জন্যও পশুপালন করা হয়।

■ পশুপালনের অনুকূল অবস্থা (Favourable Conditions of Pastoral) :

মূলত কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে বিশেষত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণভূমিতে বা মরু অঞ্চলের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত তৃণভূমিকে চারণভূমি বলা হয়। এ চারণভূমিতেই পশু চারণ করা হয়। উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াই প্রধান তৃণভোজী পশু, যাদের পালন করা হয়। এছাড়া মধ্য এশিয়ার উচ্চমালভূমিতে চমরী গাই (ইয়াক), মেরু অঞ্চলে বল্গা হরিণ, কোথাও কোথাও ঘোড়া বা উট ও পালন করা হয়।

চিত্র : পৃথিবীর তৃণভূমির অঞ্চল

● পশুপালনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Pastoralism) :

পশুপালন অর্থনীতি উপজীবিকা হিসাবে অত্যন্ত প্রাচীন। কিন্তু বৈশিষ্ট্য অনুসারে এটি প্রখাত তিন ধরনের হয়। যথা—যাযাবর পশুপালন (Pastoral Normads), ঋতুকালীন পশুপালন (Transhumance) বাণিজ্যিক পশুপালন (Commercial Grazing)।

(i) যাযাবর পশুপালন (Pastoral Normads) : তৃণভূমি অঞ্চলের অধিবাসী তাদের পালিত পশুদের নিয়ে এক চারণভূমি থেকে অন্যচারণভূমিতে বিচরণ করে। ফলে এদের যাযাবর জীবনযাপন করতে হয়। যেহেতু একটি তৃণভূমির তৃণ শেষ হয়ে গেলে অন্য তৃণভূমিতে চলে যেতে হয়। তাই এরা একস্থানে পশুর পালন নিয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না। তাই এদের নিদিষ্ট বাসভূমি নেই। অস্থায়ী তাঁবুই এদের আশ্রয়স্থল। পশুই এদের সম্পদ তাই প্রয়োজন না হলে

এরা মাংস খায় না বরং দুধ, বা দুধজাত দ্রব্যই এদের খাদ্য। এছাড়া দুধ, দুধজাত দ্রব্য, পশুর লোম দিয়ে নানাপ্রকার জিনিস যেমন লোম দিয়ে পশম বা চামড়ার নানা দ্রব্য, নিকটবর্তী অঞ্চলে বিক্রি করে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য বা অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করে এরা জীবনযাপন করে।

■ পশুপালক যাযাবর জাতিসমূহ :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে এই পশুপালক যাযাবর জাতি। বিভিন্ন দেশে এগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হল—

(a) মধ্য এশিয়ার পশুপালক যাযাবর জাতি :

মঙ্গোলিয়ার মধ্যভাগ, বিশেষত চীন সংলগ্ন স্থান তিব্বত, সিনকিয়াং, তুর্কিস্থানের স্টেপভূমি হল পশুপালক যাযাবরদের উন্মুক্তভূমি। এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যায় 25% থেকে 75% হল এইপ্রকার জনজাতি। এদের নাম হল কাজকাস, কিরঘিজ, কালমুখস। কাজকাসরা রয়েছে কাস্পিয়ান সাগর ও মধ্যএশিয়ার উচ্চপার্বত্য অঞ্চলে। আবার কিরঘিজরা বিচরণ করে তিয়েনসান পর্বত পামীর মালভূমি সংলগ্ন উচ্চ অববাহিকায়। আলতাই পর্বত ও তার সংলগ্ন অববাহিকা অঞ্চলে দেখা যায় কালমুখসদের। মঙ্গোলিয়দের পাওয়া যায়, উত্তর পশ্চিম চীন ও মঙ্গোলিয়ার বহিরাঞ্চলে। মধ্য এশিয়া হল সর্বাপেক্ষা শুষ্ক অঞ্চল তাই এখানকার বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে পশুপালন জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তৎকালীন সোভিয়েত সরকারের উদ্যোগে এদের জীবনযাত্রায় কিছুটা উন্নত হয়েছে।

(b) তুন্দ্রার পশুপালক যাযাবর জাতি : বিশাল মেরু অঞ্চল তুন্দ্রা নামে পরিচিত। উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ল্যাপল্যান্ড, সাইবেরিয়ার পশ্চিমভাগ, উত্তর পূর্ব সাইবেরিয়ার কামচাটকা পেনিনসুলার, পশ্চিম আলাস্কা কানাডার ম্যাকিঞ্জি উপত্যকা ইত্যাদি স্থানে পশুপালক যাযাবররা ঘুরে বেড়ায়।

ল্যাপরা বল্গাহরিণ প্রতিপালক হিসেবেই পরিচিত। তারা বল্গা হরিণের খাবার যোগার করার জন্য নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ডেও ঘুরে বেড়ায়। সাইবেরিয়ার বল্গা হরিণ পালকদের অর্থনীতিও ল্যাপদের মত। তবে বর্তমানে এরা গ্রীষ্মকালে রে, বার্লি আলুর চাষ করছে। অনেকে বর্তমানে বিভিন্ন পারিশ্রমিকভিত্তিক কাজও করছে।

(ii) ঋতুকালীন যাযাবরবৃত্তি (Transhumance) : পৃথিবীর যেসকল তৃণভূমি অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পার্থক্য রয়েছে, সেখানে যাযাবর পশুপালকরা ঋতুভিত্তিক স্থান পরিবর্তন করে একে ঋতুকালীন যাযাবর বৃত্তি বলে। তুর্কিস্তানের কিরঘিজরা আলতাই পর্বতশ্রেণীর ঋতুকালীন যাযাবর জীবনযাপন করে। যেমন ভারতের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের কুমায়ন, গাড়োয়াল, ও লাডাক অঞ্চলের অধিবাসীরা গ্রীষ্মকালে পশুর পাল নিয়ে পাহাড়ে উঁচু অংশে উঠে যায়। আবার বসন্তকালে বরফ গলে গিয়ে যখন যেখানে লতাগুল্ম, কচিঘাস জন্মায় তখন তারা গরু, ভেড়া, গাধা, চমরী গাই নিয়ে পশুচারণ করতে সেখানে নেমে আসে। এই সকল উপজাতিরা হল গুজুর, গাড়োয়ালী, গাড্ডি, ভুটিয়া, লাদারিক ইত্যাদি। এছাড়া ওয়েলসের হাকোড, স্কটল্যান্ডের সেইলিং, দক্ষিণ আমেরিকার গাউছো (Gauch) ইত্যাদি অধিবাসীরা ঋতুকালীন যাযাবর বৃত্তি পালন করে।

এশিয়া ও আফ্রিকার সবচেয়ে উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলে অনেকগুলি ঋতুকালীন পশুপালক যাযাবর গোষ্ঠী বিশেত আফগানস্তান, ইরান, ইরাক, আরব, আনাটোলয়া, সাহারা, উত্তর সুদান ও উত্তর পূর্ব আফ্রিকার উচ্চভূমি অঞ্চলে বসবাস করছে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বেদুইন জাতি, যারা মূলত মরু অঞ্চলেই বিচরণ করে। এছাড়া রয়েছে উত্তরপূর্ব আফ্রিকার মাসাই জাতি। আরবের পশুপালকরা মরু অঞ্চলের সীমানার কাছে চলে আসে, তাদের পশুর দল নিয়ে, আবার গ্রীষ্মের সময় উচ্চভূমিতে চলে যায়। তেমনি আবার মাসাইরা শীতে সাহারা মরুভূমির কাছাকাছি চলে আসে আবার গ্রীষ্মে আটলাস পর্বতের পাদদেশে চলে যায়। কারণ পার্বত্যঅঞ্চলের শীতল জলবায়ুতে গরু বেশি দুধ দেয়। মাংসও দ্রুত বাড়ে। যদিও

পশুপালনই ঋতুকালীন যাযাবর উপজীবিকার প্রধান অবলম্বন, তবুও বর্তমানে এরা সুযোগ পেলে এরা কোথাও কোথাও চাষও করে। কারণ অত্যন্ত কষ্টকর জীবনযাত্রার জন্য বর্তমানে এই পেশার অভ্যাস ত্যাগ করছে অনেক আধিবাসী। স্তেপ অঞ্চলে তাই স্থায়ী কৃষিখামার রয়েছে। আরব সরকার বিভিন্ন সরকারি সাহায্য করেছেন এদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য।

(iii) বাণিজ্যিক পশুপালন (Commercial Grazing) :

আদি পশুপালন অর্থনীতি আধুনিক পৃথিবীতে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। যদিও এর নাম বাণিজ্যিক পশুপালন। তৃণভূমি অঞ্চলে এই পশুপালন অত্যন্ত জনপ্রিয়, বিশেষত আফ্রিকার সাভানা, ব্রাজিলের ক্যাম্পোস, ভেনেজুয়েলার লানোস অঞ্চলে। এছাড়া নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কাডানার প্রেইরি, অস্ট্রেলিয়ার ভেল্ড প্রভৃতি তৃণভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বাণিজ্যিক পশুপালন হয়। বাণিজ্যিক পশুপালনের প্রধান উদ্দেশ্যই হল বাণিজ্যিক চাহিদা অনুসারে দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস ইত্যাদি উৎপাদন করা। তাই প্রচুর পরিমাণে অর্থের বিনিয়োগও এখানে হয় খামারের সাথেই থাকে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা ও বাজারজাত করার জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা।

12. কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিদের দৃষ্টিতে এই কৃষি পদ্ধতি একটি অবৈজ্ঞানিক ও ধ্বংসাত্মক। নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে বনজ সম্পদের ধ্বংস যথাযথ অব্যবহার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।
13. বনভূমি উজাড়ের কারণে মৃত্তিকা সহজে ক্ষয় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আর মৃত্তিকা ক্ষয় ভূমিধস সহ নদীপথকে সংকীর্ণ করে দেয়।
14. এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ বড় ধরনের বন উজাড়ের কারণ ঘটায় এবং ঐ বনভূমি পুনরায় গড়ে উঠতে প্রায় ৫০/৭০ বছর লেগে যায়। ফলে এ ধরণের ধ্বংস লীলা বড় আকারের ভয়ানক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।
15. যেহেতু এই কৃষি পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে জীবিকা নির্বাহী, সুতরাং যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন, বন্যা, খরা মানুষকে বহুদিন অনাহারে থাকতে বাধ্য করতে পারে।
16. যেহেতু এই কৃষি পদ্ধতি গভীর ঘন অরণ্য বিদ্যমান, সুতরাং বন্য প্রাণী, পোকামাকড় ও অসুখ বিসুখ শস্য পদ্ধতিকে ওলট পালট করে দিতে পারে।
17. পরিবেশ সংরক্ষণ কল্পে এ ধরণের কৃষি পদ্ধতি বিপজ্জনক ও তা বিভিন্ন উপায়ে নিরুৎসাহ করা উচিত।

● **আদিম জীবিকাভিত্তিক কৃষি (Primitive Subsistance Agriculture) :**

ভূগোলবিদদের মতে, আজ থেকে 10-12 হাজার বছর আগে মানুষ পশ্চিম এশিয়ার ইরান বা মেসোপটেমিয়ায় যাযাবর শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহক জীবনযাত্রা ছেড়ে চাষ বাস শুরু করে। একই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক পশুপালনে মনোনিবেশ করে। এই সময় বিভিন্ন কৃষি ফসল যেমন—গম, যব, বার্লি, ভুট্টা, ছোলা, মটরের চাষের সাথে সাথে বিভিন্ন পশু যেমন—গরু, ছাগল ভেড়া ও শূকরও প্রতিপলিত হয়। এই কৃষিকার্যের মাধ্যমে মানুষ শুধুমাত্র তার জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটায় তাই একে জীবিকা সত্ত্বাভিত্তিক কৃষি (Subsistence Farming) বলে। এই সময় প্রধানত কৃষিকে কেন্দ্র করে মানুষের মূল অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। এই কৃষি অর্থনীতির সুবাদে মানুষ প্রথম স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। নদী উপত্যকায়ই উর্বর পলি মৃত্তিকা প্রথম কৃষিকার্যের প্রচলন ঘটে।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কৃষিকার্য ও স্থায়ী সভ্যতার সূচনা হয়েছে খাদ্য সংগ্রহ ও পশুপালন যুগের পরবর্তী পর্যায়ে।

■ **বৈশিষ্ট্য :**

i. জীবিকা সত্ত্বাভিত্তিক কৃষির চরিত্র : এশিয়া মহাদেশের মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রাচ্যে এই কৃষিজীবী সমাজ রয়েছে। পুরুষানুক্রমে এই কৃষকেরা কিছু কিছু নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে এবং কৃষির জ্ঞান তাদের বংশগত কিন্তু উৎপাদনের হার বৃদ্ধির দিকে বিশেষ নজর না দেওয়ায় এই অর্থনীতির অন্তর্গত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়নি। তবে জমির একর প্রতি উৎপাদনের হার কম নয়। জমি থেকে যা উৎপাদন হয় তা প্রধানত কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রা নির্বাহের কাজে ব্যবহৃত হয়। সেই হিসাবে এই কৃষিকে **জীবিকাসত্ত্বাভিত্তিক কৃষি** বলা হয়।

ii. নিয়োগ : বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যরক্ষাকারী এই সকল গ্রামীণ সমাজে মোট শ্রমিকের প্রায় ২/৩ অংশের বেশি চাষের কাজে নিযুক্ত হয়। যদিও বছরের সবসময় অনেকলোক নিয়োগ করার মতো থাকে না। প্রধানত চারারোপন ও ফসল তোলার সময় এখানে বেশি সংখ্যায় কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। তাই বছরের একটি বড় সময় জুড়ে এই সমাজের কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের একটা বড় অংশ ছদ্মবেকারত্বের অংশীদার হয়।

iii. প্রাচীন যন্ত্রপাতি ও কায়িকশ্রমের ব্যবহার : এই সমাজে উৎপাদনকারীদের বাণিজ্যিক লক্ষ্য প্রায় থাকে না বললেই চলে। কায়িক ও দক্ষ শ্রমের উপর নির্ভরশীল এই কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও পরম্পরা অনুসারে হয়। তাই

লাঙল, মই, কাস্তে, নিড়ানি, কোদাল, শাবল ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে ইদানীংকালে জমি চাষের জন্য ট্রাক্টরের ব্যবহার চালু হয়েছে।

iv. চাষের এলাকা : এই জীবিকাসত্ত্বাভিত্তিক কৃষি প্রাথমিকভাবে মেসোপটেমিয়ার প্রচলিত হয় এবং এরপর সেখান থেকে তা সিন্ধু উপত্যকার এবং উত্তর চীনে হোয়াংহো এবং উই উপত্যকায় প্রসারিত হয়। তবে আধুনিক ধারনানুযায়ী প্রাথমিকভাবে কৃষির উদ্ভব ঘটেছিল হয়তো একই সাথে অনেকগুলি জায়গায়।

এশিয়া মহাদেশের ক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রধানত প্লাবনভূমিতে আর্দ্রজমির উপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করা হয়। প্রাথমিকভাবে আর্দ্র জমিতে ধানের চাষ হয় এবং তারপর অন্য ঋতুতে গম ও অন্যান্য ফসলের চাষ হয়। আর্দ্র জমিতে চাষ সম্ভবতঃ ভারতের অন্তর্গত বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হয়।

v. জীবজন্তুর ব্যবহার : এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষির প্রয়োজনে এবং ভারবহনের কাজে গরু, মোষ, গাধা, উট ব্যবহার করা হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মুরগী এবং শূকর পালন করা হয়। প্রধানত উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা খেয়েই এই প্রাণীরা বেঁচে থাকে। এছাড়া মাছ এখানকার খাদ্যরূপে বিবেচিত হয়। তবে শূকরের মাংসের ব্যাপারে কিছুটা ধর্মীয় নিষেধবদ্ধতা চালু আছে।

vi. উৎপাদিত ফসল : এই কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হলেও প্রধানত ধানচাষের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। ধান প্রধানতঃ সমতলভূমিতে চাষ করা হয় বলে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চভূমিতে ধান চাষের প্রাধান্য দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে ভূট্টা, বড় বড় পাতাযুক্ত শাকসবজি, ফল, বাদাম ইত্যাদির চাষা করা হয়। তবে বর্তমানে জনসংখ্যার চাপ এত বেশি যে পাহাড়ী ও পার্বত্য অঞ্চলেও অনেক পরিশ্রম করে বেশি ঢালযুক্ত ভূমিভাগকে কেটে ধাপ চাষ করা হচ্ছে। এই সমস্ত অঞ্চলের শুষ্ক ঋতুতে গম, বার্লি, মিলেট, সর্ষে, আলু ইত্যাদির চাষ করা হয়।

vii. খামার ও জমির আয়তন : কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অন্তর্গত এই সকল এলাকায় জমি বণ্টন ব্যবস্থার বিশেষত্বের কারণে কৃষি জমিগুলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত থাকে। দুটি খেতের মধ্যবর্তী সীমা আল বাঁধ দারা চিহ্নিত হয়। অধিকাংশ এলাকাতেই খামারের আয়তন ছোট এবং এক থেকে দুই হেক্টরের মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই এই খামার পাঁচ হেক্টরের বড় হয়।

সাম্প্রতিককালে এই পরম্পরাভিত্তিক কৃষির মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, প্রধানত অশিক্ষা, কুসংস্কার, অভাব ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে ঐতিহ্য অনুসারী যে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল তা ক্রমশ উন্নয়নশীল দেশগুলির ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের সুফল লাভ করে অপেক্ষাকৃত উন্নতপর্যায়ে এসে পৌছাতে ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে অথবা কোরিয়া, চীন, জাপানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও সংরক্ষণশীলতার কারণে ঐতিহ্য বা পরম্পরাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি তাহলেও উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, ট্রাক্টর, যন্ত্রচালিত লাঙলের ব্যবহার এবং ভারতের সবুজ বিপ্লবের মত কৃষি উন্নয়নের উদ্যোগ এই পরম্পরাভিত্তিক কৃষিকে অনেকাংশে মুক্ত এবং আধুনিক করে তুলেছে।

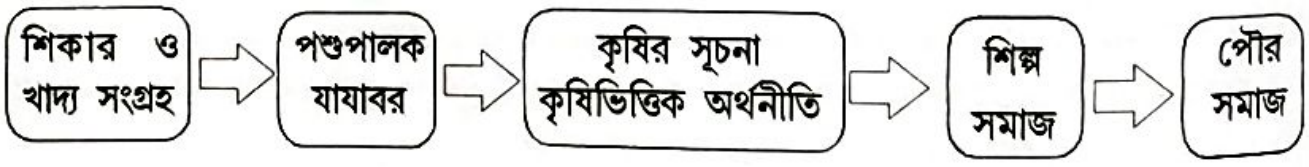

চিত্র ঃ মানব সমাজ ও তার কর্মধারার বিবর্তন

● শিল্প সমাজ (Industrial Society) :

মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারায় শিল্প সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে কৃষি সূচনার অনেক পরে। কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন কৃষিবিপ্লবের সূচনা হয়, তেমনি শিল্প বিকাশের মধ্যে দিয়ে শিল্পবিপ্লবের উদ্ভব হয়। যা মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পভিত্তিক সমাজও গড়ে উঠতে শুরু করল। শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নতুন নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হতে লাগল। শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ কারিগরি প্রকৌশল শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মূলধন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতির এই তিনটি প্রধান অঙ্গ একে অপরের পরিপূরক অবস্থায় আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

প্রথম দিকে শিল্প বলতে ছিল ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট ও কুটিরভিত্তিক হস্তশিল্প। এই সময় শিল্প দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিজস্ব শ্রম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার হত। এরপর ক্রমশ কারখানা ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠে। বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের উপর ভিত্তি করে শিল্পের ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল।

● বৈশিষ্ট্য :

1. এই সময় শিল্পভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠে।
2. এই সময় শিল্পবিপ্লবের উদ্ভবের হয়।
3. শিল্পভিত্তিক সমাজ কারিগরি প্রকৌশল শিক্ষা, বিজ্ঞান চর্চা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মূলধননির্ভর।
4. প্রথম দিকে ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট ও কুটিরভিত্তিক হস্তশিল্পই ছিল প্রধান।
5. এই সময় কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্য একে অপরের পরিপূরক ছিল।
6. কুটিরভিত্তিক শিল্প ছিল শ্রম ও যন্ত্রপাতি নির্ভর।
7. পরবর্তীতে কারখানা ভিত্তিক বৃহদায়তন শিল্প গড়ে ওঠে।
8. শ্রমবিভাগ ও বৃত্তির বিশেষায়ন হল শিল্প সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট।

■ নগরায়িত শিল্পসমাজ (Urban Industrial Society) :

মানব সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল শিল্প বিপ্লব। প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্প-বিপ্লব সমাজ ব্যবস্থার আকৃতি প্রকৃতিতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূত্রপাত করে। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ বিকাশের ইতিহাসে যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হওয়ার আগে শিল্প বলতে মূলত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট শিল্প ও কুটিরশিল্পকেই বোঝাত। তখন বিভিন্ন শিল্পের কারিগররা সাধারণত যে যার বাড়িতেই শিল্পকর্ম সম্পাদন করত তারা দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে নিজস্ব হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। কারিগররা নিজেরাই নির্ধারণ করত কোনো জিনিস উৎপাদন করবে এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করবে? উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর যাবতীয় দায়িত্ব ও কৃতিত্ব ভোগ করত কারিগররা কারণ উৎপাদিত দ্রব্যাদি কারিগরের শ্রম ও দক্ষতার ফল হিসাবে প্রতীয়মান হত। শুধু তাই নয়, আবার এই কারিগররাই ছিল বিক্রেতা। তারাই উৎপাদিত দ্রব্যাদি পৌঁছে দিত ক্রেতাসাধারণের হাতে। এবং এইভাবে কারিগরের দক্ষতা ও সুনাম উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ত সবসাধারণের মধ্যে। অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের আগে কারিগরী উৎপাদনের পন্থা-পদ্ধতি ছিল একেবারে স্বতন্ত্র ধরনের। আগেকার শিল্পব্যবস্থা ছিল বহুলাংশে পরিবার-ভিত্তিক। সাধারণত পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিরা শিল্প-দ্রব্যাদির উৎপাদন কার্যে ব্যস্ত থাকত। পরিবারের একেবারে অল্প বয়স্ক সদস্যরা উৎপাদনের সমগ্র ধারা ও কাজকর্ম একেবারে

সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করত। অতঃপর এরাই বড় হয়ে কালক্রমে একদিন দক্ষ কারিগর হিসাবে উৎপাদন কার্যে যোগ দিত। এইভাবে আগেকার শিল্পোৎপাদন পরিচালিত হত অত্যন্ত সহজ সরল ধারায়। এবং পুরুষানুক্রম শিল্পোৎপাদনের এই ধারা অব্যাহত থাকত।

■ **নগরায়িত শিল্প সমাজের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (Economic Characteristics of Urban Industrial Society) :**

(i) **মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনীতি (Profit based Economy) :**

অত্যন্ত কার্যকরী ও লাভজনক উৎপাদন ব্যবস্থা নাগরিক শিল্প ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি। প্রধানত উদ্যোক্তা এককভাবে অথবা গোষ্ঠীগতভাবে মুনাফার জন্য নগরকেন্দ্রিক শিল্পব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই প্রতিষ্ঠানিক মুনাফা এবং গঠনতান্ত্রিক **নিয়ামক** রূপে কাজ করে। সুতরাং বলা যায় যে এই শিল্প উৎপাদনের প্রধান ভিত্তি হল মুনাফা কেন্দ্রিক বিশিষ্টতা।

(ii) **গাঠনিক ব্যবস্থা** (Structural system) নগরকেন্দ্রিক শিল্পসভ্যতার ও সমাজের নানাবিধ ব্যবস্থা, নিয়ম, বিনিময় পদ্ধতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংগঠিত নিয়মানুযায়ী গড়ে উঠেছে। ব্যাঙ্ক, সরকারি প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রদানকারী সংস্থা এবং শিল্প উৎপাদনকারী সংস্থার মধ্যে নানাবিধ আদানপ্রদানের যেসব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসকল কাজকর্মে নিযুক্ত মানুষেরাই বসবাসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছ এবং শিল্পশহর অথবা মিশ্র চরিত্রের মহানগরীর উদ্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি সংস্থা যে স্থান ও বিস্তৃতি এর মধ্যে নিজেদের জড়িত রেখেছে সেই সংস্থার সঙ্গে কার্যকরী সম্পর্ক যুক্ত মানুষ বসবাসের শহর, নগর ও মহানগর গড়ে তুলেছে। সুতরাং নগরায়ন ও শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি একটি ক্রমানুযায়ী বিধিবদ্ধ নগরকেন্দ্রিক শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। যা নগারায়িত শিল্প সমাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

(ii) **অর্থনীতির মেরুকরণ (Economic Polarisation) :** নাগরিক শিল্প ব্যবস্থা বহুবিধ জটিল রাজনৈতিক অথবা সামাজিক পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছে। বহু বাণিজ্যিকগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক বহুজাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশীদার ও পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বহু আইন ও প্রণয়ন হয়েছে। যেমন, GATT অথবা World Trade Act যার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে শিল্প ব্যবস্থাও বাণিজ্যের একটিই পদ্ধতিই চালু হয়েছে। এর ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক মেরুকরণ গঠিত হয়েছে।

■ **নগরায়িত শিল্প সমাজের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য (Structural Characteristics of Urban Industrial Society) :**

(i) **ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা (Berry) :** নাগরিক শিল্পব্যবস্থা প্রধানত অধিক ব্যক্তিভিত্তিক উপাদান ও ভোগের পরিমাণকে নির্দিষ্ট করে। বেরী তাঁর সমীক্ষায় লক্ষ্য করেছেন যে ব্যক্তিভিত্তিক উৎপাদন এর ন্যয় মোট জাতীয় উৎপাদন ও (GNP) এক্ষেত্রে অধিক হয়। উদাহরণ হিসাবে USA, সুইডেন, ফ্রান্স ও জার্মানি 6000 ডলার গড় বার্ষিক আয়ের জন্য সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এ গড়ে 321 ডলার বাষিক উৎপাদনের জন্য সর্বনিম্ন স্তরে আছে। অধিক গড় আয়ের পাশিপাশি-শিল্প উন্নত দেশ অধিক ও উচ্চমানের ভোগ প্রবণতা লক্ষণীয়।

(ii) **উচ্চ ঘনত্ব (Denesed Population Density) :** গঠনগত দিক থেকে নাগরিক শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষুদ্র পরিসর স্থানে ব্যাপকভাবে উল্লম্ব এবং সমান্তরাল জনঘনত্ব সৃষ্টি করে। বহুক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অঞ্চলে এই ঘনত্বের প্রতিফলন আরও অধিক হয়। যেমন কলকাতার গড় ঘনত্ব 23000 প্রতি কিমি হলেও প্রতি বর্গকিমিতে 32000

জনসংখ্যা প্রায়ই দেখা যায়। পুরাতন বাণিজ্য অঞ্চল যেমন বড়বাজার প্রতি বর্গকিমিতে 87000 জনঘনত্ব যে কোন কর্মদিবসে লক্ষণীয়।

(iii) **উন্নত প্রযুক্তি নির্ভরতা** (Advance technological dependibility) : নাগরিক শিল্প ব্যবস্থার আর একটি গঠনগত বৈশিষ্ট্য হল এখানে উচ্চস্তরের প্রযুক্তিও শিল্পকেন্দ্রের অবস্থান। গবেষণা ও অধিকারের দ্বারাই এই আর্থ সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে এবং এজন্য স্বাভাবিক ভাবেই এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও যাবতীয় গবেষণাগারগুলির কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়।

● **নগরায়িত শিল্পসমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্য (Social Characteristics of Urban Industrial Society) :**

(i) নাগরিক শিল্প ব্যবস্থা প্রধানত অবক্ষয় ও অস্থির সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায় এই ধরনের শিল্পশহরে অপরাধ ও সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবনতি দেখা যায়।

(ii) নারী পুরুষের অনুপাতে সবক্ষেত্রেই শিল্প শহরে কম হয়। সাধারণত 881 থেকে 900 জন নারী প্রতি 1000 জন পুরুষ অনুপাতে এই সব শহরে লক্ষ্য করা যায়।

(iii) এইসব শিল্পকেন্দ্রিক সমাজে শহরের মধ্যে ক্ষতের ন্যায় বস্তি, ঘেটো, জাতিগত বিভেদ অনুযায়ী ঝুপড়ি ব্যাপকভাবে দেখা যায়। পৃথিবীর সকল শহরেই এই ধরনের অবক্ষয় ও নানাবিধ শোষণের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে নাগরিক শিল্পব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কালে গ্রামীণ পরিবেশে নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ তন্ত্র বজায় রেখে শহর আধুনিক করার প্রচেষ্টা ও যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি উন্নয়নশীল দেশ থেকেও এই পরিবর্তনের ধারা সক্রিয় আছে।